



# খালেদা জিয়ার ঘুম কী ভাঙবে

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি খালেদা জিয়ার পল্টনের একটি নির্বাচনী জনসভার। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে সমগ্র বাংলাদেশ চষে বেড়িয়েছিলেন খালেদা জিয়া। শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ না হলেও শেখ হাসিনার চেয়ে অনেক বেশি এবং কার্যকর সফর করেছিলেন খালেদা জিয়া।

ছবিটিতে খালেদা জিয়ার চোখে ক্লান্তির ঘুম। ঘুমোনের জন্য তিনি কোনো সময় নষ্ট করতে চাননি।

আরো বেশি মানুষের কাছে যেতে চেয়েছেন, গিয়েছেন।

এর ফলও পেয়েছেন। জনগণ তাকে ভোট দিয়ে প্রতিদান দিয়েছেন। খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী

নির্বাচিত হয়েছেন।

জনগণ আশা করেছিল প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার ক্লান্তি কেটে যাবে। তিনি আত্মনিয়োগ করবেন দেশ ও জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে। কিন্তু গত তিন বছরে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এই তিন বছরে দেশের মানুষ অদ্ভুত এবং বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করছে সবকিছুতেই সরকার অসম্ভব রকমের নির্বিকার। কোনো কিছুতেই যেন রিঅ্যাকশন নেই। গভারের পেটে চিমটি দিলে নাকি প্রতিক্রিয়া হয় দিন সাতেক পরে। আমাদের সরকারের অবস্থাও হয়েছে তেমন। ঘটনা ঘটছে, বরছে রক্ত, মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত।

অথচ সরকার প্রতিক্রিয়াহীন। অনেক দিন পর হঠাৎ করে রিঅ্যাকশন প্রকাশ করে, আবার নির্বিকার।

কিছু মানুষ এখনো বিশ্বাস করে দু'টি শিংওয়ালা একজন দেবতা তার শিংয়ের ওপর পৃথিবীটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। দেবতা যখন এক শিং থেকে পৃথিবীটাকে আরেক শিংয়ে আনেন তখন একটা ঝাঁকুনি লাগে। সে কারণেই সংঘটিত হয় ভূমিকম্প। একটি শিং ব্যথা না হওয়া পর্যন্ত দেবতা নড়াচড়া করেন না। ঘুমিয়ে থাকেন। পৃথিবীর ওপর দিয়ে কতকিছু ঘটে যায়, কোনো কিছুতেই তার প্রতিক্রিয়া হয় না। জোট সরকারের আচার-আচরণ এবং কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যার বেশ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। 'অপারেশন

ক্লিনহাট' বা 'র‍্যাব', 'চিতা'র অভিযান যেন তারই প্রমাণ।

জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই ১০০ দিনের একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। এই কর্মসূচিতে স্পষ্টভাবে কিছু কাজের কথা বলেছিল। দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মন্ত্রী এবং আমলাদের।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছিলেন মন্ত্রীরা ডায়নামিক না হলে তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। বিশালাকার এক মন্ত্রিসভা গঠন করে দেশবাসীকে বলেছিলেন, এদের অভিজ্ঞ করে তোলা হবে যাতে প্রশাসন পরিচালনায় কোনো প্রকার শৈথিল্য না আসে। প্রধানমন্ত্রীর এমন ঘোষণায় দেশের মানুষ কিছুটা সন্দেহ মিশ্রিত আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। সরকার জনমানুষের মনের সন্দেহটা দূর করতে পারেনি। ১০০ দিনের জায়গায় পার হয়ে গেল ১ হাজার ৯৫ দিন। অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। সরকারের কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা গেল না।

খালেদা জিয়ার ভাষণের কথাগুলো কাগজে-কলমেই লিপিবদ্ধ আছে, বাস্তবে রূপ নেয়নি। সরকারের কাজকর্ম দেখলে মনে হয় বিশাল এক আলস্য যেন ভর করেছে তাদের। নড়েচড়ে বসতে ইচ্ছা করে না। গত তিনটি বছর ঘুমিয়ে পার করে দিয়েছেন। আগামী দু'বছরের ঘুমের ঘোরে পার করে দিতে চাইছেন। দেশের মানুষ এখন হিসাব কষতে বসেছেন- যে কথা দিয়ে চারদলীয় জোট ভোট নিয়েছিল সেই কথাগুলো তারা রেখেছে কি না।

**প্র**থমই আসে সন্ত্রাসীদের প্রসঙ্গ। কারণ আওয়ামী লীগ শাসনের ভিআইপি সন্ত্রাসই দেশের মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করেছিল। আওয়ামী লীগের ঐ সন্ত্রাস ও দুঃশাসন নিয়ে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী 'সাবাস বাংলাদেশ' তৈরি করেছিলেন। প্রচার করেছিলেন দেশজুড়ে। আওয়ামী লীগের সেই ভিআইপি সন্ত্রাস জোট আমলে এসে দ্রুত কখন গণসন্ত্রাসী হয়ে উঠলো, সরকার যেন তা টেরই পেল না। খালেদা জিয়া সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঐ সব সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে এমন সব কথাবার্তা বলা শুরু করলেন, যাতে সবাই বুঝে নিল যে সন্ত্রাসই এখন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে ব্যাপারে জোট

সরকারের কিছু করার নেই। কিছু করবে না তারা।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এক বছরের মাথায় অসহনীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছালো। নড়েচড়ে উঠলেন দেবতা। শুরু হলো 'অপারেশন ক্লিনহাট'। কিছু ছোট সন্ত্রাসী ধরা পড়লো, 'হাট অ্যাটাকে' নিহত হলো। নিহতের তালিকায় যুক্ত হলো কিছু সাধারণ মানুষের নামও। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই কমে গেল। ছোট সন্ত্রাসীরা গা-ঢাকা দিল। বড় সন্ত্রাসীরা চলে গেল সীমান্ত পার হয়ে। অনেকটা নিরাপদ হয়ে গেল সমাজ। ফলে বিতর্ক থাকলেও 'অপারেশন ক্লিনহাট'কে স্বাগত জানালো মানুষ। কিন্তু বিষয়টি সরকারের জন্য সুখকর হলো না। নিজের সরকারকে বাঁচানোর জন্য পাস করতে হলো ইনডেমনিটি আইন। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড বন্ধের জন্য যে ইনডেমনিটি



এই তিন বছরে দেশের মানুষ অদ্ভুত এবং বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করছে সবকিছুতেই সরকার অসম্ভব রকমের নির্বিকার। কোনো কিছুতেই যেন রিঅ্যাকশন নেই। গভারের পেটে চিমটি দিলে নাকি প্রতিক্রিয়া হয় দিন সাতেক পরে। আমাদের সরকারের অবস্থাও হয়েছে তেমন। ঘটনা ঘটছে, ঝরছে রক্ত, মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত। অথচ সরকার প্রতিক্রিয়াহীন। অনেক দিন পর হঠাৎ করে রিঅ্যাকশন প্রকাশ করে, আবার নির্বিকার

আইন জারি করা হয়েছিল, তা এতো দিন ইতিহাসের কলঙ্ক হয়ে ছিল। এখন এর সঙ্গে আরেকটি কলঙ্ক যুক্ত হলো। কিন্তু জোট সরকারের তাতে কোনো বোধোদয় হলো না। সেনাবাহিনী ফিরে গেল ক্যান্টনমেন্টে। সরকার আবার নির্বিকারভাবে ঘুমিয়ে পড়লো। জেগে উঠলো সন্ত্রাসী। তারা আবার ফিরে এলো প্রতাপের সঙ্গে। শুরু হলো হত্যা, সন্ত্রাস, দখল, চাঁদাবাজি...।

এবার গঠন করা হলো 'র‍্যাব'। অভিযানে নামলেন তারা। ধরা পড়লো কিছু শীর্ষ সন্ত্রাসী। হাট অ্যাটাকে নয়, মারা পড়তে শুরু করলো 'ক্রস ফায়ারে'। আইন এবং মানবতার দৃষ্টিতে 'ক্রস ফায়ার' নিয়ে বড় রকমের প্রশ্ন আছে। কিন্তু প্রশ্ন নেই সাধারণ মানুষের মনে। সন্ত্রাসীর শাস্তি হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে- এটাই মানুষের শেষ কথা। কারণ মানুষ এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। কোনো মানবতার গল্প মানুষ শুনতে চায় না। তারা কাজ দেখতে চায়। সাধারণ মানুষ মনে করে র‍্যাব সেই কাজ করেছে, করছে।

বোঝা যায় 'ক্রস ফায়ার' একটি

পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে 'র‍্যাব'কে। যেভাবে 'হাট অ্যাটাকে'র ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল সেনাবাহিনীকে।

জোট সরকারের কর্মকাণ্ড দেখলে মনে হয় দেশ চলছে জোড়াতালি দিয়ে, পরিকল্পনাহীনভাবে। এক একটি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠছে। যখন আর নির্বিকার থাকা সম্ভব হচ্ছে না তখন হঠাৎ করে জেগে উঠছে।

এতে কাজের কাজ কী হচ্ছে? সাধারণ মানুষ ক্রস ফায়ারের হত্যাকাণ্ডকে স্বাগত জানাচ্ছেন কেন?

কারণ মানুষ খুব ভালো করে জানে পিচ্চি হান্নান বা লিটুদের বিচার করা যাবে না। মামলা এমনভাবে সাজানো হবে প্রচলিত আইনে তাদের অপরাধ প্রমাণ হবে না। দ্রুত বিচারে ফাঁসির আদেশ হলেও রায় কবে কার্যকর হবে কেউ জানে না। সেকারণে অমানবিক হত্যাকাণ্ডকে মানুষ স্বাগত জানাচ্ছে। মানুষ এও জানে এভাবে

সত্যিকারের অপরাধ দমন হবে না। এক হান্নানের স্থানে তৈরি হবে আরো অনেক হান্নান। অপরাধ তখনই কমতো যদি সমূলে উৎপাটন করা যেত হান্নানদের।

হান্নানদের রাজনীতিবিদরূপী গডফাদার আছে, আছে বিশাল বাহিনী, অস্ত্রের ভান্ডার। হান্নানরা নিহত হলেও এসবই থেকে যাচ্ছে অক্ষত। অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ছে এক হাত থেকে অন্য হাতে। যদি গডফাদারদের চিহ্নিত করা যেত, অস্ত্র উদ্ধার হতো, গ্রেপ্তার হতো তার বাহিনী তাহলে সন্ত্রাসও নির্মূল হতো।

এখন র‍্যাবের অভিযান যতদিন চলবে, পরিস্থিতি ততদিন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তারপর সরকার ঘুমিয়ে পড়লে, ফিরে আসবে সন্ত্রাসীরা...।

প্রধানমন্ত্রী ১০০ দিনের কর্মসূচিতে সন্ত্রাস নির্মূল করতে চেয়েছিলেন, ১০০ দিনে তো নয়ই ১ হাজার ৯৫ দিনেও পারেন নি। বলা যায় আন্তরিকভাবে চেষ্টাই করেননি। তার কথা এবং কাজে মিল পাওয়া যায়নি। তিনি বলেছিলেন কোনো সন্ত্রাসীদের দলে আশ্রয় দেয়া হবে না। আহমইদ্যার মতো জামায়াত-

শিবিরের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীকে বিএনপি ফুল দিয়ে বরণ করে নিয়েছে।

এটাই কী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদের নমুনা!

যদিও আইমইদ্যাকে ক্রস ফায়ারে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু দলে তাকে নেয়া হলো কেন? বিএনপির নেতাকর্মী এখনো তার পক্ষে কথা বলছে কীভাবে? সরকারের আচরণে স্ববিরোধিতা কেন?

**প্র**ধানমন্ত্রী বলেছিলেন, যারা আওয়ামী লীগ শাসনামলে রাজনৈতিক কারণে নিগৃহীত হয়েছিলেন, তাদের মুক্তি দিতে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিন্তু সেই

বিস্ফোরিত হলো। বেগম জিয়া বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন করলেন ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে ঐ বোমা হামলার দায় বিরোধী দলের ওপর চাপিয়ে দিতে গ্রেপ্তারি অভিযান চালালেন আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।

ময়মনসিংহের বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতা মতিউর রহমান ও তার ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হলো। গ্রেপ্তার করা হলো বিরোধী দলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরীকে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত

সরকারের তিন বছরের মাথায় এসে এবার যে ঘটনা ঘটলো তাতে কেবল বাংলাদেশ কেঁপে উঠল না, সারা বিশ্বেই এর প্রতিক্রিয়া ঘটল। ২১ আগস্ট ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে বিরোধীদলীয়



নেত্রী শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা, আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমানসহ ২১ জনের মৃত্যু খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসীর মনে জোট সরকারের ব্যাপারে প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। দেশবাসী বুঝতে পারছে না জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নকারী এতো বড় ঘটনা জোট সরকারের ঘুম ভাঙিয়েছে কি না। নাকি তারা সেই গুল্লের অলসের মতো ঘরে আগুন লাগার পরও বলছে, 'কত রবি জ্বলে রে! কেবা আঁখি মেলে রে।'

একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার এক মাস পেরিয়ে গেছে। জোট সরকার ঐ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন করেছে। ইন্টারপোল

এসেছে। এফবিআই এসেছে। কিন্তু ঐ গ্রেনেড রহস্য রহস্যই থেকে যাচ্ছে।

**এ**ই রহস্যময়তাই জোট সরকারের ৩ বছরের শাসনকে আরো প্রশ্নবদ্ধ করেছে। বোমাবাজির পাশাপাশি সরকারের এই ৩ বছরেই বগুড়ায় বিপুল পরিমাণ গুলি ও বিস্ফোরক ধরা পড়েছে। সে সম্পর্কে সরকারের সে সময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে, ঐ গুলি-বিস্ফোরক দিয়ে ঢাকা মহানগরের এক-তৃতীয়াংশ উড়িয়ে দেয়া যায়। কিন্তু ঐ গুলি-বিস্ফোরক কারা আনলো তার হদিস পাওয়া গেল না। সরকারি তদন্ত ক'দিন পর কেমন মিইয়ে গেল। বগুড়ার পাশের জয়পুরহাটে ঘটলো পুলিশ ও জঙ্গিদের সংঘর্ষ। এবারও সরকারের প্রতিক্রিয়া শীতল। এখনও সন্ধান পাওয়া যায়নি কারা ঐ সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত ছিল। যদিও স্থানীয় মানুষ সব কিছুই জানে। কেন যেন মৌলবাদী জঙ্গি সন্ত্রাসীদের উত্থানের বিষয়টি গোপন রাখতে চায় সরকার।

এ ক্ষেত্রে একটি যুক্তি হতে পারে এমন যে, প্রকাশ পেলে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে। চুপচাপ থেকে, সব কিছু গোপন করে রাখলেই কী মৌলবাদের উত্থান বন্ধ হয়ে যাবে? বিপদের সময় হাতি জঙ্গলের ভেতরে মাথা লুকায়। বিশাল শরীর থাকে জঙ্গলের বাইরে। হাতি মনে করে সে যেহেতু কিছু

বিশালাকার এক মস্তিসভা গঠন করে দেশবাসীকে বলেছিলেন, এদের অভিজ্ঞ করে তোলা হবে যাতে প্রশাসন পরিচালনায় কোনো প্রকার শৈথিল্য না আসে। প্রধানমন্ত্রীর এমন ঘোষণায় দেশের মানুষ কিছুটা সন্দেহ মিশ্রিত আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। সরকার জনমানুষের মনের সন্দেহটা দূর করতে পারেনি। ১০০ দিনের জায়গায় পার হয়ে গেল ১ হাজার ৯৫ দিন। অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। সরকারের কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা গেল না

আইনি প্রক্রিয়ায় যে হাজার চল্লিশেক মানুষ মুক্তি পেল, দেখা গেল তাদের বড় একটি অংশ হত্যা-ধর্ষণ-অপহরণের সঙ্গে যুক্ত এবং ইতিমধ্যেই বিচারের প্রক্রিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হতে চলেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আদেশ অমান্য করে কে? সুতরাং ঐসব বিচার বন্ধ করে তাদের মুক্তি দিতে হলো। দেশে কোনো বিচার ব্যবস্থা আছে এটা উপলব্ধি করা যায় না। এমনকি যে সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্টকেও প্রশ্নাতীত রাখা হয়নি। বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, বিচার কাজে দলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ বন্ধের যে দাবি উঠেছে আইনজীবীদের পক্ষ থেকে, তাতেও কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করছে না সরকার। জোট শাসনামলের তিন বছরে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ থেকে শুরু করে নিম্ন আদালত পর্যন্ত অব্যবস্থার এক মহোৎসব শুরু হয়েছে যেন। এরপর একটি ন্যায়ানুগ স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

কোনো বোমা বিস্ফোরণের রহস্যই উদ্ঘাটন করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কথা দিয়েছিলেন যে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে এসব বোমা বিস্ফোরণের সুরাহা করা হবে। বন্ধ করা হবে এই প্রাণঘাতী ঘটনা। কিন্তু ঘটনা ঘটলো তার উল্টো। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন অপারেশন ক্লিন হার্ট চলার সময়ই ময়মনসিংহে সিনেমা হলে ঈদের পরদিন একের পর এক বোমা

কমিশন অবশ্য তাদের রিপোর্টে ঐ বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে এদের কারও সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পেল না। খুঁজে পেল না ঐ বোমা বিস্ফোরণের সূত্র। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এভাবে রাজনীতিকরণ অতি স্বাভাবিকভাবেই বোমাবাজদের উৎসাহ জোগালো। ময়মনসিংহে সিনেমা হলের ঘটনার পর এবার বোমা বিস্ফোরিত হলো সিলেটে হজরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারে। ওরসে আসা সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটলো। এবার সূত্র পাওয়া গেল। এ বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার ক'দিন আগেই জামায়াতের নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ঐ সিলেটেই মাজার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু জোট সরকারের তদন্ত সেদিকে গেলো না। শাহজালাল মাজারের বোমা তদন্তের ঘটনা সিআইডি'র ফাইলে ধামাচাপা পড়ে আছে। ইতিমধ্যে ঘটলো দ্বিতীয় দফা আক্রমণ। এবার শাহজালাল মাজারে আক্রান্ত হলেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরী। ঐ ঘটনা তদন্তে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এল। কিন্তু খালেদা জিয়ার জোট সরকারের পুলিশ প্রশাসনকে নাড়াতে পারলো না। ইতিমধ্যে সিলেটে দু'দফায় আবার বোমা বিস্ফোরণ, গ্রেনেড হামলার ঘটনা। কিন্তু সরকারের চেতনা ঘটায় কে? বরং পুরনো কায়দায় ঐসব বোমা হামলা ঘটনার দায় চাপানোর চেষ্টা হলো বিরোধী দলের ওপর।



দেখছে না, সুতরাং তাকেও কেউ দেখছে না। জোট সরকারের অবস্থা হয়েছে এই 'রুদ্দমান' হাতির মতো!

চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টাইলজার ঘাটে ১০ ট্রাক অস্ত্র চালান ধরা পড়লো। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে এলো সেখানে। ঐ ঘাটের পাহারাদার আনোয়ার মনে করেছিল যে কোনো চোরাচালান হচ্ছে বুঝি। বুঝতে পারেনি কিসে তারা হাত দিয়েছে। সংবাদপত্রে খবর বেরুল, পুলিশের এক ওসি অস্ত্র চালান খালাসের ব্যাপারটা দেখাশোনা করছিল। কিন্তু তদন্তভার দেয়া হলো তাদের ওপরই। অস্ত্র বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক জার্নালে এই অস্ত্র চালান ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, হংকং থেকে অস্ত্রের চালান জাহাজে উঠেছে। ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচজন ভারতীয় গ্রেপ্তার হয়েছে। যাদের বলা হয়েছে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী। কিন্তু সরকারের তদন্তে ধরা পড়লো, মামলার চার্জশিট হলো ঐ অস্ত্র বহন খালাসকারী শ্রমিক, অস্ত্রবহনকারী ট্রাকের মালিক-কর্মচারী, স্থানীয় ইউপি মহিলা মেম্বর। পুলিশের ঐ তদন্ত এতোই কাঁচা ছিল যে, কোর্ট পর্যন্ত তা গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। এতো বড় অস্ত্র চালানোর ঘটনাকেও সরকার কার্পেটের নিচে ঠেলে দিল। প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের দিকে গেল না।

সন্ত্রাস, বোমাবাজি, অস্ত্র চালানোর ঘটনার কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি। জনজীবনের নিরাপত্তা জাতীয় জীবনের নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো হিসাবের বাইরে রেখে দিয়েছে সরকার। এ নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কি ঘটছে তাতে সরকার নির্বিকার। জাতীয় পর্যায়ে এসব ঘটনা নিয়ে বিরোধীদের আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ঐ আন্দোলন ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করছে। বিরোধীদের অভিযোগ, জোট সরকারের ৩ বছরের আমলের এসব বোমা-গ্রেনেড হামলা, অস্ত্র চালানোর ঘটনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী চক্র এবং এ দেশে তাদের স্থানীয় মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক চক্র

## ২০০১ সালের ১৯ নবেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে খালেদা জিয়ার ১০০ দিনের কর্মসূচি

- \* চারদলীয় জোটকে জয়যুক্ত করতে ধন্যবাদ দিবস পালিত।
- \* অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও তাদের বিচার।
- \* সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা। সেখানে সব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ করা।
- \* বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি ও রাজনৈতিক মুক্তির আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা।
- \* প্রশাসনে পূর্বের সকল অন্যায় আদেশ বাতিল করা।
- \* চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর এবং এয়ারপোর্টের বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম দূর করার উদ্যোগ নেয়া।
- \* '৯৬-এর শেয়ার মার্কেট কেলঙ্কারির প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ।
- \* আলোচিত বোমা বিস্ফোরণে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু।
- \* পাড়া মহল্লা শহর ও গ্রামে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে আইন শৃঙ্খলা নাগরিক কমিটি গঠন করা।
- \* দুর্নীতির সকল অভিযোগের তদন্ত, দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করা।
- \* আগামী ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিজয়ের ৩০ বছর পালন করা।
- \* গার্মেন্টসের কোটা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অনুরোধ টিম বিদেশে পাঠানো।
- \* ম্যানপাওয়ার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা টিম বিদেশে পাঠানো।
- \* ন্যাম সম্মেলন বাতিল করা। কিছু আন্তর্জাতিক অনাড়ম্বর সেমিনারের আয়োজন করা।
- \* আর্সেনিক বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার।
- \* কম্পিউটারে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার।
- \* প্রধান জেলা শহরে কম্পিউটার ক্লাব নেটওয়ার্কিং করে সাইবার ক্লাব স্থাপন।
- \* ছয়টি বিভাগীয় শহরে ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা।
- \* প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উদ্যোগ নেয়া।
- \* জেলা শহরের তরুণদের মোটর ড্রাইভিং শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা।
- \* কর্মজীবী নারীদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা।
- \* স্থল ও জলপথে দুর্ঘটনা কমানোর জন্য রিসার্চ সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া।

### সচিব কমিটির সুপারিশ

- \* সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক আশ্রয় না দেয়া।
- \* অবৈধ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে টাঙ্কফোর্স গঠন।
- \* এক বছরের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন স্থগিত করা।
- \* রপ্তানি খাতের জন্য প্যাকেজ প্রোগ্রাম নেয়া।

জড়িত আছে। জড়িত আছে দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা ইসলামী জঙ্গি বাহিনী। এই সরকারের আমলে নির্বিঘ্নেই তারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। দেশে একটি ইসলামী বিপ্লব সাধন এদের লক্ষ্য। কিন্তু জোটের প্রধান দল বিএনপি ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তা মানতে রাজি নন।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মুরব্বিরাজ এখন আশঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এফবিআইকে পাঠিয়েছে নিজের থেকে খুঁজে দেখার জন্য যে, এসব ঘটনার পেছনে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী চক্রের কোনো যোগাযোগ আছে কি না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষজ্ঞ সাবেক সিআইএ কর্মকর্তাও ঘুরে গেছেন। প্রস্তাব দিয়ে গেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সন্ত্রাসবিরোধী জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের। সব শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলে গেছেন, সরকার ও বিরোধী দল যদি তাদের সংঘাতের রাজনীতি অব্যাহত রাখে, তবে ‘অপশক্তি’ জায়গা করে নেবে। তিনি এ ধরনের হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেছেন যে, বাংলাদেশের গণতন্ত্রও হারিয়ে যেতে পারে।

কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, প্রতিবেশী ভারত- সবাই উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে। সবাই সাহায্য করতে চেয়েছে। কিন্তু জোট সরকার নির্বিকার। বরং এই নাজুক অবস্থাতেই জোট সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে চেয়েছে ভারতের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হুঁশ এসেছে বাংলাদেশ সরকারের। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনে উভয় দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী দিয়ে সমন্বিত টহলের ব্যবস্থা করতে রাজি হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে

ফাঁদে বন্দি হয়ে পড়েছে। এই তিন বছরে দেশ থেকে বিদেশী প্রতিষ্ঠান একের পর এক বিদায় নিয়েছে। ডিএফআই বা ডাইরেস্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট কমে গেছে। শেষ বছরে কোটা উঠে যাওয়ায় পোশাক শিল্প মুখ খুবড়ে পড়বে। সরকারের সে সম্পর্কেও কোনো ভাবনাচিন্তা নেই। আদমজী থেকে নিউজপ্রিন্ট, চিনি শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে একের পর এক। বন্যায় দেশ ভাসিয়ে নিলেও সরকারের ঘুম ভাঙে না। প্রধানমন্ত্রী বরং বলেন, বন্যা কেবল অভিধাপ নয়, তার ভালো দিকও আছে। পলিমাটিতে ভরে যাবে দেশ। ফসল উঠবে ঘরে। এখন যে পানির সঙ্গে পলি আসে না, আসে বালু। হাজার হাজার একর জমি পরিণত হয় বালুর মরুভূমিতে। ঘুমিয়ে থেকে সে খবর রাখে না সরকার। সরকার ব্যস্ত বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিয়ে। সিপিডি কী হিসাব করলো সেটা নিয়ে সাইফুর রহমানের বাগ্যুদ্ধ চলে। বন্যায় সব হারানো মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেয়ে

পারেনি। সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে ভিজিএফের কার্ড বিলি ব্যবস্থার জন্য। বস্ত্ত, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে দেশে কোনো সরকার আছে কি না সেটা বোঝাই দুষ্কর। বিএনপির গত শাসনামলের নাম দিয়েছিল সে শাসনের বিরোধী জাতীয় পার্টির নেতা ও বর্তমান জোট সরকারের আইন মন্ত্রী- ‘A government of non-governance’ শাসনহীন এক শাসন। এবারও সেই সংস্কৃতির বিশেষ কোনো হেরফের হয়নি। বরং দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভার এই সরকারকে চালিকাশক্তিহীন করে তুলেছে। সন্ত্রাসের হুকুম, বোমা-গ্রেনেডের বিস্ফোরণ, চোরাচালান, অস্ত্রের ঝনঝনানি কোনো কিছুই সরকারকে তার গভীর ঘুম থেকে জাগাতে পারছে না।



**রা**বনের ছোট ভাইয়ের নাম ছিল কুস্কর্ক। রামায়ণের এই কুস্কর্ক একবার ঘুমালে ছয় মাসের আগে জাগতেন না। রিপভ্যান উইঙ্কেলকে আমরা চিনি না, জানি। তার গল্প পড়ে, শুনে তাকে জেনেছি। রিপভ্যান উইঙ্কেল রূপক চরিত্র। তিনি একনাগাড়ে ঘুমিয়েছিলেন দু’য়ুগেরও বেশি সময়। যখন তিনি ঘুমিয়েছিলেন তখন তার দাড়ি-গোঁফ ছিল না। চুল ছিল ছোট, কালো। আর যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তখন তার লম্বা

**আওয়ামী লীগের সেই ভিআইপি সন্ত্রাস জোট আমলে এসে দ্রুত কখন গণসন্ত্রাসী হয়ে উঠলো, সরকার যেন তা টেরই পেল না। খালেদা জিয়া সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঐ সব সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে এমন সব কথাবার্তা বলা শুরু করলেন, যাতে সবাই বুঝে নিল যে সন্ত্রাসই এখন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে ব্যাপারে জোট সরকারের কিছু করার নেই। কিছু করবে না তারা**

ভারতের সঙ্গে নদীর পানি বন্টন, বাণিজ্য আলোচনায় নেতিবাচক যে প্রভাব পড়েছে সেটা কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যাবে তার কোনো দিকনির্দেশনা নেই।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এ দেশের ছেলেমেয়েরা যাতে টিকতে পারে তার জন্য জেলায় জেলায় ল্যান্ডস্কেপ ল্যান্ডস্কেপের প্রতিষ্ঠা করাসহ নানা উদ্যোগের কথা বলেছিলেন। জোট শাসনে একটা আধুনিকতার ছাপ আনার কথাও বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল সরকারের গতিশীলতার কথা। কিন্তু জোট সরকারের রাজনীতির অচলায়তনে সবকিছুই ঠেকে গেছে। জোট শাসনের প্রথম তিন বছরে ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলতা পশ্চাৎপদ মৌলবাদী ধারারই বিকাশ ঘটেছে। দেশের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে সেই শক্তির হাতে। মূল্যবোধের ঘটেছে চরম অবক্ষয়। দেশের ভাবমূর্তি দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়নের

বাগ্যুদ্ধই যেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে! যদিও এই সময়ে সামষ্টিক অর্থনীতিতে গতিশীলতা এনেছেন সাইফুর রহমান। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। আওয়ামী লীগ রেখে গিয়েছিল এর অর্ধেকেরও কম। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছেন। শেয়ার বাজার উর্ধ্বমুখী হয়েছে। সংস্কারের নামে অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে আয় বৈষম্য বাড়িয়েছেন। সংস্কারের নীতি নিয়ে তিনি সমালোচিত হয়েছেন।

**স**রকারের তিন বছর পূর্তির মাধ্যম দেশের উত্তরাঞ্চলে শুরু হয়েছে মঙ্গার পদধ্বনি। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো বন্যার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। কিন্তু অতিবর্ষণের জন্য সীমান্তের ওপার থেকে পানির ঢল নেমে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনপদগুলো। বন্যা পুনর্বাসনের কাজের জন্য সরকার আর নিজের ওপর ভরসা করতে

দাড়ি-গোঁফ, চুল। সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। বদলে গেছে তার আশপাশের মানুষ, প্রকৃতি সবকিছু।

সেই চরিত্রগুলোকে আমরা এখন দেখছি বাস্তবে, রাজনীতিতে। রাজনীতিবিদরা প্রতিশ্রুতির পাহাড় সাজিয়ে ক্ষমতায় আসছেন। যা কিছু করার কথা ছিল বা করার ছিল, তার প্রায় কিছুই করছেন না।

খালেদা জিয়াকে জনগণ এনেছিল বিপুল উৎসাহে শান্তির আশায়। কিন্তু এখন মানুষের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তিনি ঘুমাচ্ছেন। সরকারের ঘুম রহস্যময় হয়ে উঠেছে মানুষের কাছে। রহস্যময়তা একটি সরকারকে নিয়ে যায় গল্প কথায়।

**প্র**চ্ছদের ছবির ঘুম আর খালেদা জিয়ার এখনকার ঘুমের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ঘুম ক্লাস্তির নয়, ক্ষমতার আয়েশের। এ যেন রামায়ণের কুস্কর্কের ঘুম। যা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে রিপভ্যান উইঙ্কেলের ঘুমের দিকে।